Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal, Published by DRAFT

ভারত-সংস্কৃতির দূত: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুমনকুমার গাঁতাইত

গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

ভাষাচার্য হিসাবে সুনীতিকুমারের ব্যাপক পরিচিতি থাকলেও তিনি মূলত ভেবেছেন মানুষের সংস্কৃতি নিয়ে। যেহেতু ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন তাঁকে একইসঙ্গে ভারতীয় উত্তরাধিকারের মহত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল, তাই ভারতীয় সংস্কৃতিও হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে স্বাভাবিক অনুধ্যান ও অনুসন্ধানের বিষয়। তিনি বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাবচ্ছেদের মধ্যে বাঙালি জাতির ইতিহাসকে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি এর সাথে উপলব্ধি করেন, যে বাঙালি খাঁটি বাঙালি হতে পারেনি তারপক্ষে ভারতীয় মহাজাতির শরিক হওয়া সম্ভব নয়, একই ভাবে অন্য প্রদেশের ভারতীয়দের জন্যও একথা প্রযোজ্য। আবার যিনি ভারতীয় মহাজাতির শরিক হতে পারেননি, তাঁর পক্ষে বিশ্ব সংস্কৃতির শরিক হওয়াও প্রায় একপ্রকার অসম্ভব। 'বসুধেব কুটুম্বকম্'- এর ভাবনায় তাঁর সংস্কৃতি চিন্তা চালিত; রবীন্দ্রনাথের 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' ভাবনায় তিনি নিজেকে ঋদ্ধ করেছেন আজীবন। বর্তমানে আমাদের চারিপাশে সাংস্কৃতিক বিপন্নতা দেখা দিয়েছে নানা দিক থেকে, এই বিপন্নতার মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে পৌঁছে দিতে একসময় যিনি অগ্রণী মনীষীর ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁর চেতনাকে আমরা কীভাবে অন্তরে গ্রহণ করতে পারি। মনেকরি, বাঙালি তথা ভারতীয় সংস্কৃতির এই প্রকৃত আর্দশকে উপলব্ধি করতে পারলেই আমাদের আত্মিক মুক্তি সম্ভব। আমাদের এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে তাই আলোচনা করা হয়েছে।

শব্দসূচক: নবজাগরণ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, হিন্দু, ধর্ম, বাঙালি, ভারতীয়, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, স্বাধীনতা, স্বদেশী আন্দোলন

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের যে সময়ে (১৮৯০, ২৬শে নভেম্বর) জন্মে ছিলেন তখন ভারতবাসী বিদেশী শক্তি ইংরেজদের পদানত; ইংরেজ শক্তি ভারতবাসীদের স্বাধীনতার সর্বব্যাপী আন্দোলনকে ছলে বলে কৌশলে পরাজিত করে রেখেছিল। সুচতুর ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতের নানা জাতি, ধর্মের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐক্যকে নষ্ট করছিল। সেই সময়ের ইংরেজি শিক্ষিত নব্য ভারতীয়রা বুঝেছিলেন শুধুমাত্র অস্ত্র-সস্ত্র দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হবে না; বৌদ্ধিক দিক থেকে ভারতীয়দের শিক্ষিত বা সংস্কৃতিবান না করতে পারলে, ভারতবাসী হিসাবে গৌরববোধ না অর্জন করলে, ভারতীয়দের ঐক্য সাধন ঘটবে না বা স্বাধীনতা যুদ্ধে জয় লাভও সম্ভব নয়। সেই কাজে ইউরোপ থেকে শিক্ষিত ভারতীয়দের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সর্বগ্রাহী শিক্ষার ক্ষুধা নিয়ে ভারতীয়দের নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্বার্থক ভাবে ত্বরান্বিত করেছিল। উনিশ শতকের নবজাগরণকৃত বাঙালিরা তাঁদের হারিয়ে যাওয়া চেতনাকে বিভিন্ন ধারায় প্রস্ফুটিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সুনীতিকুমারের বেড়ে ওঠা ও কর্ম প্রবাহ বিশ শতকে হলেও তিনি উনিশ শতকের ভাবধায় পুষ্ট। সেই ভাবেই গড়ে উঠেছিল তাঁর চারিত্রবলয়; একদম সাধারণ নিম্নবৃত্ত ইংরেজ কোম্পানির মাস মাস মাইনের কেরানি ঘরে সুনীতির জন্ম, তথাকথিত ভালো স্কুলের পরিবর্তে স্বাভাবিক ভাবেই মোতী শীলের ফ্রী ইস্কুলে বাকি ভাইদের সঙ্গে ভরতি হয়েছিলেন। স্কুলের শিক্ষকরা খুব বেশি শিক্ষিত না হলেও তাঁরা উজাড় করে দিতেন ছাত্রদের। সুনীতিকুমারদের পাঠ্য বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিদ্যাসাগর

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal. Published by DRAFT

মহাশয়ের ‘বর্ণপরিচয়’। পরবর্তীকালে গবেষকরা ভাষাচার্যের চরিত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের তুলনা করেছেন- উভয়েই ছিলেন গরীব বাঙালি হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, তাসত্ত্বেও তাঁরা দুজনেই নিজেদের প্রতিভায়, দক্ষতায়, বিদ্যার অধ্যাবসায় এক জ্যোতির্ময় বলয় অর্জন করেছিলেন। সেই জ্যোর্তিময় আভিজাত্য কোনো প্রকার অর্থ কৌলীন্যের নয়, বরং তার উলটো; একেবারে শুদ্ধ চিন্তার, স্বচ্ছ মননের, সাংস্কৃতিক অভিরুচির এবং সর্বোপরি তাঁদের পাণ্ডিত্যের।[১] বাংলা ভাষা ও বাঙালির জীবনে বিদ্যাসাগর এমন কৃতির ছাপ রেখেছেন, সেখানে বড় বড় পণ্ডিতদের কর্মকেও ছোট মনে হয়; সেইরকম অনেকটাই অধ্যাপক সুনীতিকুমারের সৃষ্টিরাজি এই সময়ে বিচার করতে বসলে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতের কৃতকর্ম অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র মনে হয়। বিদ্যাসাগরের মতোই সুনীতিকুমার ধর্মীয় আচার সম্পর্কে উৎসাহিত না দেখিয়ে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের জন্য কলম পেষন করেছেন।

সুনীতিকুমার উনিশ শতকের নবজাগরণ স্নাত শেষ বাঙালি, তাঁকে বলা যেতে পারে Last of the greats। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীদের দ্বারা স্কুল জীবন থেকেই প্রবাহিত হয়েছেন। বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু বাকিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। বিদ্যাসাগর যখন ইহজগত ত্যাগ করেন সুনীতিকুমার তখন নেহাত দুগ্ধশিশু, নরেন্দ্রনাথ দত্ত সুনীতির বাবা হরিদাসের বাল্যবন্ধু; তাসত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি ভেবে সুনীতিকুমার আক্ষেপ করেছেন। মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি বিবেকানন্দের সাহিত্যের বই আর বক্তৃতা পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে সময়েই উপনিষদ পড়া শুরু করছিলেন, এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা নিয়ে নিজস্ব মৌলিক ধারণা তৈরী করলেন। এই সময় স্বদেশী আন্দোলনের যুগ; স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল হাওয়া চারিদিকে। এ হাওয়াতে অনেক বাঙালির মতোই সুনীতিকুমারের বিদ্যাচর্চার অভিমুখ তৈরী হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিদেশী শক্তির হাত থেকে ভারতবাসীদের মুক্তির অদম্য ইচ্ছায় তৎকালীন ভারতীয়রা যে যেমন ভাবে পেরেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামে

যোগদান করেছেন। সুনীতিকুমার প্রাচ্য ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়েই সে আন্দোলনে নিজেকে সামিল করেছেন। তাঁরা তখন বিশ্বাস করতেন স্বদেশকে স্বাধীনতা দিতে গেলে আগে তাকে জানতে হবে নিজ দেশের ইতিহাস-সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্ম ইত্যাদিকে, সেটুকু ভালো করে না জানলে দেশের জন্য কোনো ফাঁকা গৌরব করে বেশিদিন কাজ এগোবে না। এই সত্যটা তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি তথা ভারতীয়রা ভালো করেই বুঝেছিলেন এবং যতটা সম্ভব স্বদেশবাসীদের বোঝানোর চেষ্ঠা করেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বরাবর দমন-পীড়নের ক্রুর নীতির প্রাবল্যে দেশাত্মবোধে অচ্ছেদ্য ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন ভেদাভেদ, প্রতিহিংসা, ঘৃণার বীজ বপন করতে সচেষ্ট ছিল।

> "ব্রিটিশ শাসন মুক্তি-কামী ভারতবাসীর কাছে এক ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জ রূপে দেখা দিল। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় গান্ধীজি এবং তাঁর অনুগামীরা যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক আন্দোলনকে হাতিয়ার করেছিলেন তেমনি রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো সমাজ-স্বদেশ-রাজনীতি সচেতন স্বদেশ প্রিয় কবি-সাহিত্যিকেরাও তাঁদের বিভিন্ন কর্মধারা সভা-সমিতিতে ভাষণ প্রদান, প্রাসঙ্গিক রচনার মাধ্যমে বিচিত্র জাতি-ধর্মের-বর্ণের ভারতীয়দের ভারতবোধকে অটুট রাখতে প্রয়াস চালিয়েছিলেন।"[২]

পারিপাশ্বিক অবস্থানের কারণে স্বাভাবিক ভাবেই সুনীতিকুমারের হৃদয় স্বদেশপ্রীতিতে পূর্ণ হয়েছে। এরমধ্যে তিনি অবনীন্দ্রনাথ ও আর্টস্কুলের ছবি দেখে তাঁর হৃদয়কে বিচলিত করেছেন, সহপাঠী গোরার থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আগ্রহ তৈরী করে ফেলেছেন, তখন তিনি মাত্র চৌদ্দ-পনের বছরের বালক। কবির কবিতার বিষয়, কবিতার উপস্থাপন, ভাষার ঝংকার, প্রকাশ ভঙ্গী সব কিছুই নতুন লাগছিল; প্রথম পড়ার প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে বালক বয়সে সুনীতিকুমার পেয়েছিলেন এক অবর্ননীয় অনুভূতি, রবীন্দ্ররচনার আধ্যাত্মিক দিকটি তাঁকে প্রাণ শক্তিতে পরিপূর্ণ করে তোলে। কবির কাব্যের কিরণ'ছটা সুনীতিকুমারের মনের চীরকালীন সত্যকে আলোকিত করে রেখেছিল।

সুনীতিকুমার যখন কলেজের ছাত্র তখন থেকেই তাঁর ভাষা সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। তাঁর স্বাভাবিক আগ্রহ গ্রীক গথিক ও ইংরেজি ভাষা, তিনি লক্ষ করলেন ইউরোপ বা আমেরিকার মানুষরা তাঁদের নিজেদের ভাষা নিয়ে কত যত্নশীল। তাদের ভাষার প্রাচীনত্বের বিন্দুমাত্র নষ্ট হতে দেয়নি। সেদিক থেকে বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নির্মাণ বিদেশী হাতে পড়ে ভুল পথে চালিত হয়েছে, আবার গোঁড়া ভারতীয়তা বাংলা ভাষার মৌলিকত্বকে বিসর্জন দিয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে বাংলা ব্যাকরণের নির্মাণ করার চেষ্ঠা করেছেন। ফলে বাংলা ভাষার 'নষ্ঠকোষ্ঠী' উদ্ধারে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন কলেজ জীবনের শুরু থেকেই। ছাত্রাবস্তায় জুবলী পুরষ্কার ও প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ তাঁর পড়াশোনার সহায়ক হয়েছিল, এরপর ১৯১৪ তে অধ্যাপনার পেশাতে গিয়ে আবার লন্ডনে উচ্চতর গবেষণার জন্য সুযোগ পেলেন সম্পূর্ণ তৎকালীন সরকারী খরচে। ১৯১৯ সে তিনি লন্ডন গিয়ে সময়ের আগেই মাত্র দু'বছরে 'Indo Aryan Linguistics – Origin and Development of the Bengali Language' বিষয়ে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। সময় ও অর্থ দুই বেঁচে থাকায় তিনি প্যারিসে গিয়ে ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা করেন। এই সময় তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে নিবিড় ভাবে দেখেছিলেন। সুনীতিকুমার যখন লন্ডনে ছিলেন সেই সময় সেখানে রবীন্দ্রনাথ সেখানে গিয়েছিলেন, অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের তুলনায় সুনীতিকুমার বয়সে বড় ছিলেন বলেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ওই সফরে কিছু ক্ষেত্রে সুনীতিকুমারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এখান থেকেই তাঁদের প্রকৃতপক্ষে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পায়, এই সম্পর্কও সুনীতিকুমারের জীবনভর কর্মসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল।

১৯২২ সালে তিনি উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চা শেষষ করে দেশে ফিরলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই কৃতি ছাত্রকে 'খয়রা' অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত যেকোনো ভাষা বিভাগের পাঠক্রমে তিনি স্বছন্দে বিচরন করতেন, সেই সঙ্গে পারসিক ভাষার অধ্যাপক তারাপোরেওয়ালার কাছে 'অবেস্তা' চর্চার নিয়মিত পাঠ নিতেন। ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে কবি অধ্যাপক কালীদাস নাগের উদ্যোগে 'গ্রেটার

ইন্ডিয়া সোসাইটি' তৈরি হল ভারততত্ব পাঠের উদ্দেশে। প্রতিষ্ঠানটির দিকপাল সদস্যেরা হলেন – সুবোধ মুখার্জী, প্রবোধ বাগচী, হেম রায়চৌধুরী, সুনীতিকুমারের মতো তরুণ পণ্ডিতবর্গেরা। যদিও আনুষ্ঠানিক প্রকাশের আগেই এঁরা প্রত্যেকেই বৃহত্তর ভারতবিদ্যা চর্চায় যুক্ত ছিলেন। গোপাল হালদার তাঁর স্মৃতিকথায় এব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন-

> "ঊনবিংশ শতাব্দীতেও গ্রেটার ইন্ডিয়ার একটা ব্যভিচার বিলাস হয়েছিল— সাগর পাড়ে ভারতীয় কুলি চালান দিয়ে। ইংরেজ তার স্রষ্টা ছিল— নিজের গ্রেটার শোষণের প্রয়োজনে। বিংশ শতাব্দীতে আমরা জাতিস্মর হয়ে উঠলাম। ভারতীয় মৈত্রী-ভাবনার স্মৃতি-স্বপ্ন তখন রচনা করেন প্রথম বিশ্বভারতীর কবি প্রতিষ্ঠাতা। গ্রেটার ইন্ডিয়া সোসাইটির বাঙালি অধ্যাপকরা সে স্বপ্ন-পথের সন্ধান পান একদিকে রবীন্দ্রনাথ থেকে, অন্যদিকে ফরাসি ওলন্দাজ ইংরেজ প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের মধ্যে মধ্য এশিয়ায় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায়; তাতে তাঁরাই আবিষ্কার করলেন ভারতের প্রসার। তারাই সে পথ আবার পরিচিত করে তোলেন অন্য ভারতীয়দের কাছে, অবশ্য রবীন্দ্রনাথই পুরোধা।
>
> বিশের দশকের আমরা কলেজ ছাড়া বাঙালি যুবকরা তাতে রীতিমতো নেচে উঠতাম। এদিকে দেখি বিনা হস্তে রবীন্দ্রনাথ 'সাগর জলে নিনান করা' রূপসীর দ্বারে স্বাগত; অন্যদিকে ড. কালিদাস নাগ প্রমুখরা ভারতীয় সংস্কৃতির জয়ঢাক নিয়ে কখনো জাভায়, কখনো চীনে। এভাবে ভারতীয় জাতীয়তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক দুই ভাব সূত্রের গ্রন্থিবন্ধন করেছিলেন কবি ও বাঙালি গবেষকরা। তাতে ভারতীয় জাতীয়তাও সাংস্কৃতিক ছোপ পড়েছিল।" (৩)

আসলে উনবিংশ শতকের এই পণ্ডিতরা সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনে না গিয়ে ভারতীয়দের প্রকৃত ইতিহাস-সংস্কৃতি-ধর্মের পাঠ পড়াতে চাইলেন, যার মধ্য দিয়ে ভারতীয়রা নিজস্ব কর্ম পৃথিবীর চোখ ফেরাবে আমাদের প্রাচীন

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal, Published by DRAFT

ভারতের প্রতি, সমকালীন ভারতবর্ষ তো বটেই, একই সঙ্গে ঐতিহ্যে ও উৎসে; ইনাদের পূর্ববর্তী সময়ে রামমোহন, অতীশ দীপঙ্কর, অশোক, বুদ্ধ প্রভৃতি পেরিয়ে সুপ্রচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে।

১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক সুনীতিকুমারের গবেষণা কর্মটি পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়ে 'The Origin and development of the Bengali Language' নামে প্রকাশিত হল, তখন বাংলা ও ভারতীয় ভাষাচর্চার জগতে নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া গেল। সুনীতিকুমার প্রমাণ করেছিলেন বাঙালি ও বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সকলেই এই তরুণ অধ্যাপকটির সমাদর জানালেন, এই বইটি তাঁকে প্রতিষ্ঠিত ভাষাবিদ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। মৌলিক চিন্তা-ভাবনাতে রাজা রামমোহন (১৮২৬, ১৮৩৬), চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৫), নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (১৮৯৮), হৃষীকেশ শাস্ত্রীর পর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রেবেদী ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েরা বাংলা ব্যাকরণ নির্মাণে সত্যদৃষ্টির ছাপ রেখেছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কারবারি হলেও ১৯০১ সালে তিনি লিখলেন 'শব্দতত্ত্ব'। বইটির সম্পর্কে সুনীতিকুমার জানান-

> "...কবির সমীক্ষাশক্তিকে শত-সহস্র সাধুবাদ দিতে লাগলুম। এমন করে তাঁর পূর্ব বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য আর কারও তো চোখে পড়েনি! আর বৈশিষ্ট্যগুলি শুধু যে ধরেছেন তা নয়, বৈশিষ্ট্যগুলি কেমনভাবে কাজ করেছে সে-বিষয়ে যেন তাঁর একটা দিব্য দৃষ্টি এসে গিয়েছে। ইউরোপের যেসব ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত, সাধারণ ভাষা নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতি তো আমার জন্যে তৈরিই ছিল। তা ছাড়া, সহজ মোটা কথা যা আমরা সকলেই জানি, তার ভিতরে কী সূক্ষ্ম ধ্বনি বিষয়ক বা ভাব বিষয়ক রীতি কাজ করেছে সেটা আমাদের কাছে এ পর্যন্ত অজ্ঞাত থাকছিল, তার কতকগুলি বিষয়ে ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথেই পাওয়া গেল।"(৪)

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal. Published by DRAFT

এই কারণেই তিনি বাংলা ভাষার ভাষাতত্ত্ব বা ভাষার ইতিহাসের আলোচকদের মধ্যে কবিকে 'পাইয়নিয়র বা অগ্রণী পথিকৃৎ' বলে মনে করেছেন। ও.ডি.বি.এল ভূমিকাতেও রবীন্দ্রনাথকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও সুনীতিকে নিছক ভাষাবিদ বলে মনে করেননি, প্রাচ্য বিষয়ক পণ্ডিত বলে মনে করতেন বলেই ১৯২৭ এর দ্বীপময় ভারত ভ্রমণে তিনি সুনীতিকুমারকে আমন্ত্রণ জানায়। সুনীতিকুমারের কাছে এই সুযোগ ছিল এক পরম পাওয়া। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ যে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রচলন করেছিলেন, এবং ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে বহির্বিশ্বের যা কিছু ভালোকে মেলাতে চাইছিলেন এই ভ্রমণে গিয়ে সুনীতিকুমার তার উপলব্দি করলেন এবং আজীবন সেই ভারত সংস্কৃতির দূত হয়ে কাজ করলেন। 'জাভাযাত্রীর পত্রে' অন্তত আঠারোবার তিনি সুনীতিকুমারের কথা বলেছেন প্রসংশনীয় ভাবেই। সুনীতিকুমারের এই ভ্রমণ কাহিনি সে সময়ের 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তিনি টুকরো টুকরো জিনিসকে জোড়া দিতে চমৎকার ভাবে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিগুলোকে 'বাদশাহী চিঠি' বলে জানিয়েছেন- সুনীতির লেখার মধ্যে ঝর্ণার জলের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কলের জল নয়। সুনীতির 'দর্শনশক্তি' আর 'ধারণাশক্তি'র উপর বর্ণনা করার ক্ষমতা দেখে কবি তাঁকে উপন্যাস লেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভাষাচার্য তা করেননি তবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন মানবপ্রেমকে আপন করে নিয়েছিলেন। আর কবিই তাঁকে নিজের উপন্যাসে 'অমরত্ব' দিয়েছেন।

তিন মাসের এই যাত্রাকালে বিস্ময় হয়ে দেখেছেন কবি সম্পর্কে বহির্বিশ্বের মুগদ্ধতা। তিনি যেখানেই গেছেন আপন ব্যক্তিত্ব ও প্রকাশগুণে সকলের হৃদয়কে জয় করে নিয়েছেন। ইন্দোনেশিয়া-মালেশিয়া-থাইল্যান্ড-মায়ানমার সব জায়গাতেই সব জাতির মানুষের মধ্যে কবির সমান কদর। সুনীতিকুমার উপলব্ধি করেছেন বহুকাল ধরে এই সবদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ফলে ভারতের সভ্যতার, সংস্কৃতির, ধর্মের প্রভাব খুব রয়েছে। রামায়াণ-মহাভারতের কাহিনি ছাড়াও, পুরাণের নানা কাহিনি অল্পকিছু পরিবর্তন করে সে দেশের জনসমাজে বহুল প্রচলিত।

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal, Published by DRAFT

রবীন্দ্রনাথের আদেশে এই সময় তিনি কিছু জায়গায় পৌরহিত্য ও শাস্ত্র পাঠ করে সেদেশের মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। দ্বীপময় দেশের ভঙ্গ মন্দির বা প্রাচীন লোককথা সুনীতির মনকে আচ্ছন্ন করেছিল; যা শেষ বয়সে (১৯৭৬ সালে সাহিত্য অকাদেমির রামায়ণ নিয়ে আলোচনায় বিতর্ক সৃষ্ট করেছিলেন) এসেও রাম-কথা নিয়ে তিনি প্রচলিত বিশ্বাসের বাইরে বস্তুনিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ বাড়ির সন্তান স্বরূপ তিনি কিছু ধর্মীয় আচার পালন নিশ্চয় করতেন; কিন্তু সারস্বতচর্চায় তিনি ছিলেন প্রচণ্ড যুক্তিবাদী ও নিরপেক্ষ। এই সফরে তিনি উপলব্ধি করেন ভারতের বৌদ্ধধর্ম চীনে গেলেও চীনের বৌদ্ধধর্মের দর্শন পুরোপুরি ভারতীয় দর্শনের কাঠামোয় ফিট করেনা। বরং চীনারা তাদের ধর্মীয় দর্শনকে যুগোপযোগী কর্মবাদে পরিনত করেছিল। জাতীয়তাবাদী বিপ্লবে চীনা জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকেই তারা অগ্রগণী স্থান দিয়েছে; দ্বীপময় ভারতের পর তিনি লন্ডন, ফ্রান্স, আমেরিকা যখন যেখানেই গেছেন সেখানে তিনি চীনাদের একই মনোভাবকে দেখতে পেয়েছিলেন। যথেষ্ঠ পরিমান খাদ্য গ্রহণ আর অমানুষিক পরিশ্রম তাদের জীবনের প্রধান বিয়য়। আমরা বর্তমানে প্রায় এক শতাব্দীর পর চীনাদের বিশ্বজুড়ে যে আধিপত্যবাদ দেখছি তারই ফল। 'রবীন্দ্র সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ' যখন প্রকাশ পেলো তখন ভাষাচার্যের জ্ঞানচর্চার আর একটি দিক উন্মোচিত হয়েছিল। তিনি পাঠকদের উপলব্দি করান একটা যুগে ভারতসংস্কৃতির নৌবানিজ্যের সহায়তায় জলপথে সদূর এই দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছেছিল ও বিকশিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ের ঔপনিবেশিক শাসক সেই ঐতিহ্যের প্রবাহকে রোধ করেছে।

সাধারণ ভাবে দেখা যায় ইংরেজ শাসনে ঔপনিবেশিক যুগে কোনো ভারতীয় ভারতর্চার বাইরে কোনো আগ্রহ দেখালে সেটা ইউরোপ বা আমেরিকায় সীমাবদ্ধ থেকে যায়; অথচ সুনীতিকুমার বহিঃভারতচর্চা বিচিত্রগামী। তিনি প্যারিসকে স্বপ্ন নগরী বললেও, ভারতছাড়া তাঁকে অন্য কোনো দেশের নাগরিক হতে সুযোগ দিলে তিনি প্রাচীন গ্রীসের নাগরিক হবে জানিয়েছিলেন, তিনি গ্রিক শিল্প-সাহিত্যের রস গ্রহণ করবেন বলে প্রাচীন গ্রীক ভাষা তিনি

শিখেছিলেন, বাংলা ভাষায় ফারসীর অবদানের খোঁজে আর একই রকম ফারসী-ঈরানীয় সাহিত্যের রস গ্রহন করবেন বলে সে ভাষাগুলো শিখেছিলেন ব্যাকরণ সহ; এমনই তাঁর সর্বগ্রাসী শিক্ষার প্রবণতা ছিল। তিনি ইরান, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব নিয়েও সার্বিক জ্ঞান গড়ে তুলেছিল এবং নিজের পাণ্ডিত্যের বৈচিত্রতা বৃদ্ধি করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ থেকে ও তৃতীয় দশকের শুরু থেকেই ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমারের জীবনে সারস্বত সাধনার আর এক অধ্যায় যুক্ত হয়েছিল। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রিত প্রতিনিধি রূপে যোগ দান করেন, এবং প্রাচ্যভাষাতত্ত্ব বিভাগের আলোচনায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। একই সফরে চেকোশ্লোভিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, জার্মান, ফ্রান্স, বার্লিন প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিভিন্ন ইস্টিটিউশনের আলোচক হিসাবে গিয়ে ভারতে ভাষা-সাহিত্য-শিল্পকলা, সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে মত আদান-প্রদান করে আসেন। এরপর ১৯৩৮ সালের তৃতীয় আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মেলনেও গেন্ট শহরে তিনি উপস্থিত ছিলেন। কোপেনহাগেন শহরে আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ব সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই বছর পোলান্ড ও প্যারিসের দুটো বিশ্বমানের প্রাচ্যবিদ্যাকেন্দ্র তাঁকে সাম্মানিক সভ্যরূপে গ্রহন করেছিল; যা তাঁর ভাষাবিজ্ঞানীর সঙ্গে প্রাচ্যবিদ হিসাবেও গৌরব বৃদ্ধি করেছিল।

ভারতের স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে তিনি পুনরায় ইউরোপ ভ্রমণ করেন, প্যারিসে ভাষাতত্ত্বের সম্মেলন, ব্রাসেলসে নৃতত্ত্ব বিষয়ক সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন, এবং ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেন। এই সফরে তিনি মিশর যান, এবং প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় মিশরের কী অবদান সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। ১৯৫০ ও ৫১ এর ইউরোপ ভ্রমণ বিদেশীদের কাছে তাঁর স্বীকৃতির বছর; ইতালি হল্যান্ডের মতো তিনি ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির জয়গান করে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ বিভাগে পাঁচ মাসের অধ্যাপক হিসাবে

যোগদান করেন। সেই সময় বেশ কয়েকটি, যেমন কলম্বিয়া, ইয়েল, ওয়াশিংটন ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্ হিসাবে বক্তৃতা করেছিলেন। ১৯৫২ তে রকেফেলার ফাইন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে প্রায় একমাস মেক্সিকো ঘুরে আসেন, এবং ভারতীয় সভ্যতায় যে রেড ইন্ডিয়ানের প্রভাব আছে সে মিথকে ভেঙ্গে দেন। এই সময় মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিশ্বসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

স্বাধীনদেশ হিসাবে ভারত বিদেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে কোন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করবে সে ব্যাপারেও সুনীতিকুমার তাঁর দীর্ঘ বিদেশ ভ্রমণের প্রাজ্ঞতা নিয়ে পরমার্শ দিয়েছিলেন। মঙ্গোলীয়-চীন সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ কালের আগ্রহ। ভারত-চীন সংস্কৃতি সমিতির অন্যতম সভ্য তিনি। ১৯৫২ তে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হলে কট্টর চীন বিরোধীদের দ্বারা ধিকৃত হয়েছিলেন। ১৯৫৪ তে পশ্চিম আফ্রিকার যান, ঘানা, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে যান ভারত সংস্কৃতির দূত হয়ে, ওই সব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন এবং দু'দেশের সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। দেশে ফিরে আফ্রিকা নিয়ে তাঁর সুবিখ্যাত বই 'Afrikanism : The African Personality' (১৯৬০) সালে প্রকাশ করেন। ৫৪তেই কেমব্রিজে ২৩তম ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ওরিয়েন্টালিস্টস সম্মেলনে ভারতের শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি রূপে, একই ভূমিকায় ইন্দোনেশিয়াতেও ভাষা সম্মেলনে যান।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় একাডেমি অব সায়েন্সের আমন্ত্রণে যান, এবং তিন মাস তিনি ছিলেন। মস্কোতে স্লাভ ভাষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাসখন্ডে এশিয়া ও আফ্রিকার লেখক সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধি রূপে যোগদান করেন। ওখান থেকে ফিরে এলে ইন্দো-চীন মৈত্রী সংঘের অতিথি হয়ে তিন সপ্তাহের জন্য চীন দেশে যান। সেখানে তিনি ভারত ও চীনের প্রাচীন যোগসূত্র বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন, ১৯৫৯ সালে তিনি অস্ট্রেলিয়া যান ভারত সরকারের প্রতিনিধি স্বরূপ। ১৯৬০এ আবার মস্কো যান ভারতীয়দলের প্রধান রূপে। ১৯৬১

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV. Issue 1. 2025. (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal. Published by DRAFT

তে রোম, ইতালি, ইরান ভ্রমণ করেন। পরের বছর ডাবলিন, হাওয়াই, জাপান, ফিলিপিন গিয়েছিলেন। ১৯৬৬-৬৭ তেও তাঁকে অনেকগুলো সরকারি কাজের দায় নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণে যেতে হয়েছিল। মহিশূরে ভারত সরকারে প্রতিষ্ঠিত চীন বিদ্যাকেন্দ্রের পরিদর্শনে যান, তারপর তিব্বতে শরণার্থী কেন্দ্র দেখার জন্য সরকার তাঁকে নির্বাচিত করেছিল। ১৯৭৫এ ভারত সংস্কৃতির পুরোধা হয়ে তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষ বিদেশ ভ্রমণ ছিল ইতালির তুরিনে 'সেকেন্ড ইন্টারন্যাশান্যাল কন্‌গ্রেস ফর স্যাংস্কৃট ইন এশিয়া'তে যোগদান করেন, সেবারে তিনি 'সংস্কৃত-দিগ্বিজয়' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।

ঔপনিবেশিক শাসনকালে কলকাতার এক কেরানির সন্তান সুনীতিকুমার শুধুমাত্র নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যাচর্চার জোরে পাঁচটি মহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলোতে তিনি গেছিলেন, সে সময়ের প্রেক্ষিতে তো বটেই আজও এমন বিরল সম্মান বিশেষ কারো জোটেনি। সুনীতিকুমারের বিদগ্ধতা ও গরুড়ের মতো সর্বগ্রাসী জ্ঞানের ক্ষুধা তাঁকে যেমন বিনয়ী করে তুলেছিল, তেমনি সেই পাণ্ডিত্যের সমজদার ছিল সারা বিশ্বজুড়েই। তাঁর বিদ্যাচর্চার পদ্ধতি কেমন ছিল সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁর সাক্ষাৎ বিদূষি ছাত্র অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য –

> "প্রাকপ্রস্তুতি থাকত দীর্ঘকালের অধ্যয়নে লব্ধ জ্ঞানে, পরে ঘটনাচক্রে তাঁকে পৌঁছে দিত এমন স্থানে যার সম্বন্ধে তাঁর কতক স্পষ্ট কতক-বা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। প্রত্যক্ষ পরিচয়ে ভরে উঠত ফাঁক, বাড়ত জ্ঞান আর জাগত নবতর তথ্য আহরণের উদ্দীপনা। অবচেতনে চলত একটা রসায়নিক প্রক্রিয়া; পরে একদিন তুলে নিতেন লেখনী। বিষয়টি স্পষ্ট রূপ নিত একটি গ্রন্থে। প্রাকপ্রস্তুতির পর্বে বারবার দেখা গেছে কোনো নতুন জায়গায় আমন্ত্রণ এসেছে আর অমনই সুনীতিকুমার সে-দেশের বা অঞ্চলের ভূগোল ইতিহাস সংস্কৃতি সাহিত্য শিল্প সব নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়ছেন। যেমন করে ছাত্র পড়ে আসন্ন পরীক্ষার জন্যে। সুনীতিকুমারের

ক্ষেত্রে পরীক্ষা হল : চক্ষুষ্মানের মতো নতুন স্থানের পরিচয় নেওয়া। এই প্রক্রিয়ায় সে-স্থান তার আদ্যন্য পটভূমিকা নিয়ে তাঁর জ্ঞানভান্ডারে স্থায়ী সম্পদ হয়ে উঠতো।”[৫]

বিশ্বভ্রামণিক যে শুধু বিশ্বপরিক্রমা করেছেন তা নয়, ভারতের প্রায় প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে তিনি গেছেন, সেখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজকে অনুসন্ধান করে তৃপ্ত হয়েছেন। ফলে স্বদেশ আর বিদেশের মধ্যে সংযোগসূত্র কি হতে পারে সে বিষয়ে তাঁর সম্যক ধারণা তৈরি হয়েছিল। কবির বাণী- দিবে আর নিবে, মেলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে’তে বিশ্বাসী। বিশ্বকবি বিশ্বভারতীকে ঘিরে যে আন্তর্জাতিকতাবাদ ও মানবপ্রেমের সতঃস্ফূর্ত বন্ধনের চেষ্ঠা চালিয়েছিলেন, সুনীতিকুমার সেই ঐতিহ্যকেই বহন করেছেন আজীবন। ইংরেজদের শাসন, ইউরোপীয় শিক্ষা থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি বাঙালি তথা ভারতীয়দের অন্তর থেকে আন্দোলিত করেছিল। প্রভুত্বের সংস্কৃতি ভারতীয়রা বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করেন যেমন আবার মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে বর্জন করেনি। বিবেকানন্দ ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ প্রবন্ধে অপরের ভালোটা গ্রহণ আর নিজের খারাপটা বর্জনের পক্ষে লিখেছেন। ভারতবাসীরা বহু বছরের প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছিল, নবজাগরনের পর সে সময়ের ভারতীয়রা নিজেদের সংস্কৃতির যা কিছু শাশ্বত ও সর্বজনীন আর পাশ্চাত্যের সভ্যতা-সংস্কৃতির মহত্বের মধ্যে বোঝাপড়ার ভাব তৈরি হয়েছিল; বিশ শতকে সেই শিক্ষার ঐতিহ্যকে বহন করেন সুনীতিকুমার, বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের উত্তরসময়ে তিনি যেমন স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধে পূর্ণ ছিলেন তেমনি ছিলেন পণ্ডিত ও সর্বজন স্বীকৃত সাংস্কৃতিক বোদ্ধা। অবশ্যই তিনি ভাষা বা সংস্কৃতির তত্ত্ব বা ব্যবহারিক পদ্ধতিতে নিয়ে নতুন কোনো দিক উন্মোচন করেননি, তিনি একজন যথার্থ শিক্ষক সুলভ ব্যাখ্যা রেখেছিলেন সাধারণের কাছে। আর সেই ব্যাখ্যাতে তিনি বিশেষ মাত্রা যোগ করে ভারতীয় ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যে সংস্কৃতির অনুসন্ধান পেয়েছিলেন তাঁর আগে এমন ভাবে কেউ চিহ্নিত করেননি। ভাষা চর্চার মধ্য দিয়েই বাঙালির সন্তান সুনীতিকুমার ভারতীয়বোধে উন্নিত

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal. Published by DRAFT

হয়ে পরিশেষে বিশ্বমানব সম্মিলনের চিন্তায় বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে তিনি উদ্দীপিত হন। তাই তো তিনি শুধু বাঙালিয়ানা প্রশ্নে মনে করেন শুধু বাঙালি বলে কিছু হয় না, প্রাচীন ভাষা ও জাতিগুলোর পরিচয় খুঁজে তিনি দেখেছেন বঙ্গসংস্কৃতি আর ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব থেকে ইতিবৃত্ত প্রায় এক। সেটা শুধু বাংলার ক্ষেত্রে সত্য তেমনি ভারতীয় উপমহাদেশে বাকী ভাষাভাষি জাতির ক্ষেত্রেও সত্য। আমরা সবাই ভারত-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ বিষয়ে তিনি নিজে 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে বলেছেন-

> "আমাদের মৌলিক আদর্শ হওয়া চাই এক মৌলিক বিশ্বসংস্কৃতি, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অনুসারে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ভাষা প্রভৃতির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে বহুরূপ হয়ে যা বিরাজ করবে, আর পৃথিবীর তাবৎ মানবজাতি বা মানব সমাজকে তাদের সহজ সাধারণ মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত করে এক করে তুলবে।"[৬]

সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মীয়তাবোধে ভাবিত হয়ে নিজ মনে বিশ্বমানব সমাজের সকলের সঙ্গে নিত্য যোগ তিনি অন্তর থেকেই অনুভব করতেন। তাঁর অনুমান পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির মানুষ একই সার সত্যের পথ যাত্রী; তাই সংগতির সাহায্যে বিশ্বসংস্কৃতি গড়ে তোলার কথা তিনি বলতেন। আর তিনি যখন যেখানে গেছেন মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎসমূলে পৌঁছে সে জাতির সঙ্গে ভারতীয়দের সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্ঠা করেছেন, ভারতভূমিকে আশ্রয় করে বিশ্বসংস্কৃতির সর্বমানবের মিলনভূমি করেছেন এদেশকে।

Journal of Cultural Research Studies
Volume IV, Issue 1, 2025, (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal. Published by DRAFT

তথ্যসূচি

১. নিয়োগী, গৌতম (২০১৫), আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ব্যক্তি ও ব্যাক্তিত্ব, তাপস ভৌমিক (সম্পা.), কোরক : সুনীতিকুমার শতবর্ষ সংকলন, কোরক, কলকাতা, পৃঃ ৯।

২. ঘোষাল, ছন্দা (১৪২৬), কিরাত-জন-কৃতি : সুনীতিকুমারের স্বদেশ ভারনার একটি প্রকাশ, বাণীরঞ্জন দে (সম্পা.), জ্ঞানতপস্বী সুনীতিকুমার : সার্বিক অবলোকন, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ২৬।

৩. হালদার, গোপাল (প্রকাশ সাল অনুল্লিখিত), রূপনারায়ণের কূলে (দ্বিতীয় খণ্ড), পুথিপত্র, কলকাতা, পৃঃ ৩৬।

৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (২০১৭), বিশ্বমনাঃ রবীন্দ্রনাথ, বারিদবরণ ঘোষ (সংকলন ও সম্পা.), বিগ বুকস্, কলকাতা, পৃঃ ৪১।

৫. ভট্টাচার্য, সুকুমারী (২০১৫), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃঃ ১১-১২।

৬. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (২০১৯), সাংস্কৃতিকী, আনন্দ, কলকাতা, পৃঃ ১০।